॥ সূচনাকথা ॥

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'বিদ্বজ্জন সমাগম' উপলক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। সেই সন্ধ্যা থেকে রবীন্দ্রতিরোধানের পঞ্চাশ বছর পরেও ১৯৯২ - ৯৩ - ৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ সুদীর্ঘ একশ বারো-তেরো-চোদ্দো বছর পর্যন্ত বাঙালির নাট্য-অভিজ্ঞতায় নিয়মিত অনিয়মিতভাবে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর তাঁর কবিতা - গল্প উপন্যাস বক্তৃতামালার পাশাপাশি তাঁর নানা সময়ে রচিত নাটকগুলি প্রথমদিকে তাঁর কিংবা তাঁর স্নেহধন্য ছাত্র-বন্ধুদের দ্বারা অনূদিত হয়ে ইংরেজি ভাষায় এবং তার থেকে আবার ইওরোপ - আমেরিকা বা নানা এশীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে অভিনীত হয়েছে, অন্তত ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রশতবর্ষসাল পর্যন্ত। রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ- গবেষকরা অনুমান করছেন, বর্তমানে সারা বিশ্বেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নূতন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, অতএব এই সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশের শিল্প - সংস্কৃতি চর্চায় রবীন্দ্রনাটক নতুন কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারছে কিনা, তা অবশ্যই কৌতূহলী অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন শিল্পসাধনায় যে আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবোধে পৌঁছতে চেয়েছিলেন তা অবশ্যই কেবল পশ্চিমমুখী ছিল না, এই দেশও তার প্রাদেশিক নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমভাবে গুরুত্ব পেয়েছিল সেই সাধনায়। ফলত অন্যান্য ভারতীয় ভাষাতেও রবীন্দ্রনাটকের অনুবাদ কিংবা অভিনয়ের বৃত্তান্ত রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় নাট্যপ্রকল্পেরই গভীরতর পরিচয় পেতে সাহায্য করবে।

কিন্তু এই বিস্তৃত প্রেক্ষাপট থেকে যদি আমাদের দৃষ্টিবিন্দুকে কেবলমাত্র বাংলা নাট্যভূমিতেই সরিয়ে এনে বিশেষভাবে নিবদ্ধ করি, তাহলে দেখতে পাব, তাঁর পূর্বজ- সমকালীন কিংবা পরবর্তী নাট্যরচয়িতাদের মধ্যে রচনা পরিমাণে তাঁর তুলনায় বেশি নাটক লিখেছেন হয়তো কেউ কেউ কিন্তু নাটকের প্রকার ও প্রকরণ নিয়ে তাঁর মতো নিয়ত অস্থির পরীক্ষা-নিরীক্ষা খুব কম নাট্যকারই করেছেন। প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ কিংবা কবিপক্ষে নানা জলসায়, কিংবা বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় তাঁর নৃত্যনাট্যগুলির যথেচ্ছ অভিনয় পরিমাণকে যদি বাদ দিই, তবুও কোনো পরিসংখ্যান ছাড়াই নির্দ্বিধায়

একথা বলা যায়, অন্যান্য নাট্যকারদের নাটক তাঁদের সমকালে অনেক বেশি পরিমাণে অভিনীত হয়ে থাকলেও রবীন্দ্রনাটকের মতো এত দীর্ঘকাল ধরে অভিনীত হয়নি কিংবা প্রাসঙ্গিক-আধুনিক বলে বিবেচিত হয় নি ।

আশ্চর্যের বিষয়, এই দীর্ঘ ইতিবৃত্তের পাশাপাশি প্রায় সমান্তরাল ভাবে সুদীর্ঘকাল ধরে একটি মত প্রায় অভিযোগের আকারে উচ্চারিত হয়ে আসছে যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়যোগ্য নয়, তাঁর জীবৎকাল থেকেই তাঁর রচিত নাটকগুলির গহন চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনীর জটিল রূপায়ন, প্রথাগত নাট্যরীতির হিসাবে প্রায় অ-নাটকীয় বিন্যাসভঙ্গির দরুণ এবং সর্বোপরি কবিতার শব্দ বাক্যবন্ধের মতো নিবিড় দ্যোতনাবাহী সংলাপের অভিঘাতে সমালোচকদের বিবেচনায় রূপক-সাংকেতিক পরিচয়ে পরিচিত হয়ে উঠেছে । ফলে তাঁরা নাটকগুলির এমন দুরূহ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন যাতে মনে হতে পারে, নাটকগুলি যেন কোনো এক গূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনার ফসল । অ-তত তাঁদের বিবেচনার ধরণধারণে পাঠকমনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে রবীন্দ্র নাটক অনভিনেয়, কেবলমাত্র পাঠযোগ্য — কবিতার মতো একাধিক তন্নিষ্ঠ পাঠের দ্বারা অধীতব্য । অজিতকুমার চক্রবর্তী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ রবীন্দ্র সান্নিধ্য ধন্য সমালোচকেরাও এই বিবেচনা অভ্যাসের বাইরে আসতে পারেন নি । অথচ এঁদের অনেকে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তাঁর নাটকের নানা অভিনয় কেবল দেখেন নি, নিজেরা সেই সব সমবায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন । তা সত্ত্বেও প্রমথনাথ বিশী ফতোয়া জারি করেছেন "রবীন্দ্রনাথের নাটক অসাধারণ, কিন্তু ঐ অসাধারণত্বেই তাহার ত্রুটি, সাধারণের নিকট কিছু পরিমাণে নতি স্বীকার করিলে তবেই এগুলি পূর্ণাঙ্গ নাট্যশিল্প হইয়া উঠিতে পারিত ।" (বিশী, ১৯৬৬ ; ৫০৭ - ০৮)

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর তারিখে বাংলার জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন পর্যন্ত বাংলার 'পাবলিক স্টেজ' বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রধানত দেশের আর্থ-সামাজিক রুচির ওঠাপড়ায় যেসব দ্বন্দ্ব-সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে, সেখানে রবীন্দ্রনাটকের উন্নত জীবনবোধ প্রকাশভঙ্গির রস আস্বাদনের কোনো নিয়মিত উপযুক্ত পরিবেশ কোনোকালেই তৈরি হয় নি ।

কেবল রবীন্দ্রনাটকে কেন, পৃথিবীর কোনো দেশেরই মহৎ নাট্যকার তাঁর রচনাশক্তির সম্পূর্ণ মহিমায় বাংলার পাবলিক স্টেজে উপস্থাপিত হতে পারেন নি। তাই অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ করেন "পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলিকে বিষয়বস্তু নির্বিশেষে পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শে উপস্থাপনা ও প্রযোজনায় বাস্তবধর্মিতা, নাট্যকাঠামোয় অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ, অতিনাটকীয়তা বা মেলোড্রামার ছড়াছড়ি ; অন্যদিকে সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে প্রস্তাবনা, বিদূষক, কঞ্চুকীর ব্যবহার আর যাত্রার লোকআঙ্গিক থেকে নেওয়া সখীর দল, উক্তিগীতি, বহুভাষধর্মী সংলাপ, রূপক চরিত্র এবং গান ও নাচের মনোরঞ্জক আবহ। সব মিলিয়ে এ যুগের পেশাদারী মঞ্চ যে এক বর্ণসংকর নাট্য-আঙ্গিকের জন্ম দিয়েছিল সে কথা বললে খুব ভুল হবে না।" (বন্দ্যো, ১৩৯৪ ; ১১) বস্তুতপক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটার-পূর্ব সময় থেকেই সংস্কৃত কিংবা শেক্সপিয়রীয় নাটক রূপান্তরিত-অনূদিত হয়ে এসেছে যথেচ্ছভাবেই, তারপর সাধারণের ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ ব্যবস্থা চালু হবার পর থেকে সংস্কৃত নাট্য এবং লোকনাট্য পৌরাণিক নাট্যরুচির প্রাবল্যে আত্মস্থতা অর্জনের পরিবর্তে আত্মসাৎকৃত হয়েছে। অপরদিকে শেক্সপিয়ার, মলিয়ের, শেরিডান, গোল্ডস্মিথের নাটক রূপান্তর ছাড়াও তাদের বাহ্যনাট্যরীতি নিয়ে ছদ্ম - ঐতিহাসিক বা গার্হস্থ্য ট্র্যাজেডি - কমেডি রচনার অবলম্বনে (vehicle) পর্যবসিত হয়েছে। এই বাতা - বরণের পক্ষে সবদিক থেকে উপযুক্ত ছিল যে রবীন্দ্রনাটকটি 'রাজা ও রাণী', সঙ্গত ভাবেই সেটি নানা পর্যায়ে নানা প্রযোজকের দাক্ষিণ্য পেয়েছে — বাকি সব প্রতিনিধিমূলক নাটকগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে গেছেন অ-পরীক্ষিত, অগৃহীত।

বলা বাহুল্য এ কথা বলবার সময় আমরা নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির নাম বিস্মৃত হচ্ছি না, ভুলে যাচ্ছি না তিনি কর্ণওয়ালিশ মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন 'বিসর্জন', ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন, করেছিলেন 'তপতী', ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তারিখে, রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে নাট্যরূপ করিয়ে স্টারে করেছিলেন 'যোগাযোগ', ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে — এবং স্বয়ং কবি তাঁকে দিয়েছিলেন 'রক্তকরবী' অভিনয়ের অনুমতি। কিন্তু এ কথাও আমরা মনে রাখছি, পেশাদার মঞ্চের সামগ্রিক বাতাবরণ শিশিরকুমারের অসামান্য প্রতিভার স্পর্শেও উন্নত হয়ে ওঠেনি, বরং দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী দেশ-কালের জটিলতা তাকে আরও সমস্যাসংকুল করেছে। ফলে

শিশিরকুমারের এই সব প্রয়াস বিষয়ে ইতিহাস ব্যর্থতারই সাক্ষ্য দেয় — ব্যর্থ, কিন্তু গৌরবময় সেই ব্যর্থতা ।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ঠিক তিন বছর দু মাস আঠার দিন পর, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় দিয়ে বাংলার সমান্তরাল, জীবননিষ্ঠ, পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার সূত্রপাত; বর্তমানে এই থিয়েটার পঞ্চাশ-উত্তীর্ণ । এ কথা ঠিক, শ্রী শম্ভু মিত্রের নির্দেশনাধীন বহুরূপী গোষ্ঠী এবং আরও কোনো কোনো সংগঠনের আন্তরিক প্রয়াসে এই মঞ্চেই রবীন্দ্রনাটক সর্বাধিক সার্থকভাবে প্রযোজিত । তা সত্ত্বেও এই থিয়েটারের নাট্যপরিচালক-অভিনেতা-সমালোচক - দর্শকদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাটকের দুরূহতা বিষয়ে পুরনো ধারণাগুলি সম্পূর্ণ বদলায় নি । ১৯৭৮ -৭৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩৮৫) রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় "মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ" নামে ভারতী পরিষদের যে বার্ষিকী সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে প্রখ্যাত শেখর চট্টোপাধ্যায় অনুযোগ করেছিলেন" রবীন্দ্রনাথের নাটক relevant কিন্তু living নয় । ... তাই বর্তমান তাঁর কাছে বা তিনি বর্তমানের কাছে মূল্যহীন " (চট্টোপাধ্যায় : ৬৪) বা সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন " রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার সামনে বারংবার তাঁর নাট্যচিন্তা, দর্শন ও কাব্যের স্রোতে ভেসে গেছে" (বন্দ্যোপাধ্যায় : ৬৪), উৎপল দত্ত রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনা করেও এবং তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' বইতে " রবি ঠাকুরের মূর্তি" "আধখানা মানুষ" ইত্যাদি প্রবন্ধে (দত্ত : ১৯৮৪) রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নানারকম শ্রদ্ধাজনক আলোচনা করেও এক সাক্ষাৎকারে কবুল করেছিলেন" প্রতিজ্ঞে করিছি, আর কখনো করবুনি, এই কাজটা আর কখনো করবুনি ।" (মজুমদার, ১৩৮৫ : ৭১) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নাটক আর কখনো করবেন না । সেদিনের পর আজও অবস্থা খুব বদলায় নি । তাই এই সময়েই শ্রী বিভাস চক্রবর্তী দুটি রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনার ফাঁকে রবীন্দ্রনাটককে প্রবলভাবে আক্রমণ করেন "অচেনা, অসুস্থিকর একটা সাজানো জগৎ" নামের প্রবন্ধে (চক্রবর্তী, ১৯৯১ : ১১) বর্তমান গবেষকের লেখা " রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রয়োগ : অন্তরের ছন্দ " (সমাদ্দার, ১৯৯৪ : ১১৭ - ৬৪) প্রবন্ধের সমালোচনায় লেখা হয়

"একটি বিচ্ছিন্ন সবুজ দ্বীপ যেন প্রযোজক রবীন্দ্রনাথের প্রযোগরীতি" (সুন্দরম, ১৯৯৫: ১১), অপর এক নির্দেশক শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় আবেগবজে "শ্রুধাশীল, সিরিয়াস, পৌড়ামিমুক্ত মন নিয়ে রবীন্দ্রনাটককে আক্রমণ করা দরকার হয়ে পড়েছে ... কারণ এই ব্যক্তিটিকে থিয়েটারের টার্মসে বুঝে নিতে না পারলে, আমাদের থিয়েটার একটা বড়ো কাজের শিক্ষা ও রোমাঞ্চ থেকে বঞ্চিত থাকছে" (মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৩ : ৩) ইত্যাদি লিখলেও তাঁর সাম্প্রতিক নাটক 'একা এবং একা'র মধ্যে 'যোগাযোগ' উপন্যাস/ নাট্যরূপের আংশিক প্রক্ষেপ কিংবা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব - বিদ্যালয় থেকে বহু অভিনীত 'চিরকুমার সভা'র বাইরে অন্য কোনো দুরূহ রবীন্দ্র নাটক মঞ্চস্থ করছেন না। তাই সাম্প্রতিক এক গবেষণায় "রবীন্দ্রনাটক কেবলমাত্র পাঠ করবার সামগ্রী, আদৌ অভিনয়যোগ্য নয় — এই মত এখন আর গ্রাহ্য হয় না, বরং রবীন্দ্রনাথকেই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান দেওয়া হয়" (বসু, ১৯৯৩ :৯) এমন মন্তব্য করা হলেও বিষয়টি বিতর্কোর্ধ্ব হতে পারে নি।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য, নাটক যদি তত্ত্বআশ্রয়ী হয়, তাহলে তা নাট্যদর্শককে এক দুরূহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে। একটি নাটকের একটি মাত্র অভিনয়-রজনী দেখে যে নাটক কিছুতেই দর্শকের সম্পূর্ণ বোধগম্য হয় না। কিন্তু তবু এ কথাও ঠিক যে পৃথিবীর নানা দেশে নাট্যকলা তার উদ্ভবমুহূর্ত থেকে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সজীব ও প্রাণবন্তরূপে এগিয়ে চলেছে নিশ্চয়ই দর্শকের উৎসাহের ফলে। শিল্পী মাত্রই চান ভোক্তার হৃদয় জয় করতে, ভোক্তা তাঁকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর আর শিল্পী হওয়াই হত না। সারা পৃথিবীতে নাট্যকলায় যেসব বিশাল মাপের প্রতিভাসম্পন্ন জন্মাতে পেরেছেন, তার মূলে ছিল নিশ্চয়ই দর্শকের আনুকূল্য। সেই মহৎ নাট্যকাররাও পেরেছেন দর্শকের রুচিকে উন্নত, উদ্বেজিত করতে।

নাটকের সর্বাঙ্গীন মর্যাদা প্রকাশিত হয় মঞ্চের উপরে, এই মত নিয়ে এই শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিমী তাত্ত্বিকরা কিছু বিতর্ক করলেও খ্রিস্টজন্ম পাঁচশ বছর পূর্ববর্তী আরিস্টটলের 'পোয়েটিকস্' এবং খ্রিস্টজন্ম দুশ বছর পূর্বর্তী আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে'র সময় থেকেই প্রমাণিত সত্য হয়ে আছে। কোনো কবি, বা সংগীতজ্ঞ

চিত্রকর এমন কি খেলোয়াড় যদি নাট্যকার হন তাঁকেও মনে রাখতে হয় যে নাটক প্রতিফলনাত্মক (representational) পরিবেষণমূলক শিল্পমাধ্যম। কাজেই একাধিক ব্যক্তি নাটক পাঠ করে প্রশংসা করলে তাঁর যত আনন্দ হবে, তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দিত হবেন তিনি তাঁর নাটকের মঞ্চায়ন ও দর্শকস্বীকৃতি উপভোগ করে। কবিতা নিজের আবেগে জন্ম নিতে পারে — যে কোনো শিল্পসৃজনের মূলেই শিল্পীর এই আবেগ অনিবার্য। কিন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্রে এই আবেগ নিশ্চয় অনেক বেশি তীব্র, কারণ নাট্যকার তাঁর উদ্ভাবিত কিংবা অভিজ্ঞতালব্ধ কৌশলের সাহায্য নিয়ে তাঁর চরিত্রদের আকাঙ্ক্ষিত মঞ্চমূর্তি দান করেন। সেই আকাঙ্ক্ষিত রীতিতেই তিনি নাটককে সাজান, মঞ্চের উপরে সেই সুপ্রলব্ধ নাট্যমূর্তি দেখতে চান। অনেক সময় অবশ্য এমনটাও ঘটে থাকে নাট্যকার তাঁর নাটককে যে ভাবমূর্তিতে প্রত্যক্ষ করেন, পরিচালক নানা কারণে সেই মূর্তি নির্মাণে অসমর্থ হলেন, স্তানিশ্লাভ্স্কির প্রয়োজনার আগে চেকভের যেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। চেকভের অভিজ্ঞতার কাছাকাছি অভিমানবশত আধুনিক এক ভারতীয় নাট্যকার বলেন "... যে নাটকটা আমার মনে ছিল, বাস্তবে তা অনেকটাই দেখি না — তখন মনে মনে ঐ পার্থক্যগুলিই বিচার করতে বসি। এটা অভিনেতা আর পরিচালকেরও অসুস্তির কারণ হয়ে ওঠে তখন।" (তেন্ডুলকর, ১৯৯২ : ৫৮) নাট্যকারের পক্ষে এই অভিজ্ঞতা যেমন মর্মান্তিক, তেমনি আবার নাট্যকার তেমন মঞ্চসচেতন লেখক নন, পরিচালক থিয়েটারের ভাষায় তাঁর নাটকের যাবতীয় নাট্য - সম্ভাবনার প্রমাণ রাখলেন, এমন ইতিহাসও দুর্লভ নয়। মস্কো আর্ট থিয়েটারে স্তানিশ্লাভ্স্কির সুচিন্তিত নিখুঁত পরিকল্পনা ও প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চেকভের নাটকগুলি কেবল আত্মপরিচয় নয়, খুঁজে পেয়েছিল তার আপাত হিসাব বহির্ভূত নাট্যব্যঞ্জনা।

এই দুরকম অভিজ্ঞতাই রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে ঘটেছে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৭ টায় নাট্য নিকেতন রঙ্গমঞ্চে দি টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ বিহার ভূ-কম্প পীড়িতের সাহায্যার্থে 'রক্ত-করবী' নাটকের যে অভিনয় করেন, তা দেখে তাঁকে 'ক্ষুব্ধ মনে' বাড়ি ফিরতে হয়েছিল (ঠাকুর, ১৩৭৯ : ২২৭) আবার তাঁরই দেওয়া সম্মানে ভূষিত 'নটরাজ' শিশিরকুমার ভাদুড়ির প্রযোজনায় 'যোগাযোগ' নাট্যরূপের অভিনয় প্রসঙ্গে আক্ষেপ করে তাঁকে লিখতে হয়েছিল "অর্থাভাবে শিশির যাকে তাকে নিয়ে

কাজ সারতে বাধ্য হয় যাঝের থেকে অপযশ হয় লেখার ।" (শম্ভু ১৯৬৯ : ৯৭) বিপরীতক্রমে অনেক বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে বহুরূপী গোষ্ঠী ১০ মে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে যে 'রক্তকরবী' অভিনয় করেন, নিউ এম্পায়ার মঞ্চে ১১ জুলাই সে অভিনয় দেখে প্রয়াত গোপাল হালদার লেখেন " শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র যা করতে চেয়েছেন তা অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের নকল নয়, রবীন্দ্রানুপ্রেরণায় নূতন সৃষ্টি । এজন্যই কবির তিনি আশীর্বাদভাজন হতেন । 'রক্তকরবী'কে কবি প্রাণদান করেছেন, কিন্তু 'রক্তকরবী' জীবন্ত হয়ে উঠেছে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় ।" (হালদার,১৯৮৮ : ৯৬৩)

বস্তুত নাটক ও নাট্য-প্রযোজনার মধ্যে এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি অতি সংগত, অতি স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই নাট্যকলা সর্বাধিক জীবন্ত তিলোত্তমাশিল্প । সবচেয়ে বড়ো কথা, এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন । ফলে দীর্ঘজীবন ধরে তিনি অসংখ্য নাটক রচনার মধ্য দিয়ে নাটকের রূপরীতিগত নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং তাতেই ক্ষান্ত না হয়ে ব্যস্ততম জীবনের ফাঁকে ফাঁকে প্রায় নিয়মিত সেই সব নাটকের অভিনয় করে গেছেন । বিভিন্ন সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলিয়ে, বিশেষ করে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত দুটি জীবনীগ্রন্থের সাহায্য নিয়ে আমরা সেই সব অভিনয়ের একটি কালানুক্রমিক তালিকা আজ সহজেই প্রস্তুত করতে পারি । পাশাপাশি রবীন্দ্র সাহচর্য লাভ করে সেই সব অভিনয়ের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ স্মৃতির মালায় গাঁথা ইতিহাসও লেখা হয়েছে অনেক । কিন্তু তাঁর আশেপাশে এমন লোক কমই ছিলেন, যাঁরা তাঁর প্রযোজনার প্রতিটি পর্যায় খুঁটিয়ে লক্ষ করে এক বা একাধিক নাটকের নাট্যবৈশিষ্ট্য উত্তরকালের অনুধাবনের জন্য রেখে গেছেন । বড়োজোর সেই সব স্মৃতিকথন কিংবা তাদের ভিত্তিতে লেখা সন-তারিখ মেলানো ইতিবৃত্তে বিশ্বকবি, মরমিয়াবাদী দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের মানবমূর্তি আমাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু আমরা এমন কিছু পাই না যার থেকে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের নাট্যান্বেষণটি ঠিক কী ছিল, তাঁর থিয়েটারের ডায়ালেক্‌টিক্স্ কি, কোথায় তাঁর নাটকের আধুনিকতা । কেনই বা তাঁর সমকালে বন্দিত হল না তাঁর নাট্যকার পরিচয়, এমন কি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা ছেড়ে নাট্যকর্মকে নিজের উপযুক্ত বিকাশক্ষেত্র বলে বেছে নিয়েছিলেন যিনি, পুরোনো মঞ্চভাষা যাঁর হাতে অনেকটাই উন্নত

হয়েছিল সেই শিশিরকুমার ভাদুড়ি একাধিক রবীন্দ্র নাটক প্রযোজনা করেও কেন ব্যর্থ হলেন, যে ব্যর্থতার গ্লানি তাঁর লিখিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রশ্রদ্ধায় ঢাকা পড়ে থাকলেও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় প্রায় অবজ্ঞায় আক্রমণ করে রবীন্দ্রনাটককে । কোন শ্রদ্ধা, স্বীকরণ এবং অনুধাবনের জোরে শম্ভু মিত্র একাধিক রবীন্দ্রনাটকের সফল প্রযোজনা করে তাঁর অশীতি উত্তীর্ণ বয়সে এক বেতার সাক্ষাৎকারে [২৪.৮.১৯৯৪] তাঁর পূর্বে এবং পরে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাটক হল না কেন, বিভাস চক্রবর্তীর এমন এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন "আমার মনে হয়, মূল একটা জায়গা হয়তো হতে পারে আমার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যেটুকু শ্রদ্ধা নিয়ে অন্বেষণ ছিল, সেটা বোধহয় ছিল না । ... আমরা চার অধ্যায় করেছি, রক্তকরবী করেছি। .. সেরকম উৎসাহ যদি থাকত, তাহলে অনেক লোকই তো বইটা কিনে নিয়ে দেখত যে বইটা পড়তে গিয়ে আমার এইরকম লাগছে, কিন্তু দেখতে গিয়ে তো মনে হচ্ছে যে বেশ সহজ, স্বাভাবিকভাবে কথা বলা হচ্ছে । তাহলে diction-টা কি ?"

আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাটককে কেন্দ্র করে এই বিতর্কিত ইতিহাস যে একেবারে লেখা হয়নি তা নয় । বস্তুত শ্রী শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' (ঘোষ, ১৯৭৮) বইটিতে এবং আরও নানা ছড়ানো লেখায় যথাযোগ্য মনঃসমীক্ষার সঙ্গে রবীন্দ্রনাটকের এই আধুনিক চরিত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । শ্রী পবিত্র সরকার , শ্রী কুমার রায় প্রমুখ আরও কেউ কেউ তাঁদের প্রবন্ধে নিবন্ধে একই চেষ্টা করেছেন (সরকার, ১৩৯৭ : ১২৩ - ১২৫) (রায়, ১৩৯৫ : ২৬৭ - ৭৮) । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, শ্রী শম্ভু মিত্র তাঁর লেখা সব ক'টি নিবন্ধগ্রন্থে কিংবা অগ্রন্থিত প্রবন্ধমালায় যথার্থ শিশিরকুর ধৈর্য এবং আধুনিক নাট্যবোধ নিয়ে রবীন্দ্রনাট্যসম্ভারকে নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন । রবীন্দ্ররচনাবলীতে অথবা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে মুদ্রিত নাটকগুলিকে যদি কোনো সতর্ক পাঠক অথবা ধৈর্যবান নাট্যকর্মী পূর্বোক্ত আলোচনা গ্রন্থগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করেন, আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রনাটকের আধুনিক মনঃযোগ্যতা কতদূর , তার স্বরূপ কিংবা রবীন্দ্রনাটক আদৌ মনঃযোগ্য কিনা, কোন কোন প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে রবীন্দ্রনাটকের আধুনিক চরিত্ররহস্য ভেদ করা সম্ভব, তা স্পষ্টত উপলব্ধি করবেন ।

বক্ষ্যমান গবেষণাকে সেই পাঠেরই এক বিনীত প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে । স্বভাবতই তাই এই আলোচনায় ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি কিংবা নাটকগুলির রচনামুহূর্ত থেকে স্বয়ং রচয়িতার কিংবা ভিন্ন ব্যক্তি-বর্গের সমবায়ে আয়োজিত সমস্ত অভিনয়কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়নি । বস্তুত পূর্বোক্ত লেখকদের সুগভীর পর্যালোচনায় প্ররোচিত হয়েই রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চ-সম্ভাবনা বুঝে নেবার প্রয়োজনে বিশেষভাবে লক্ষ করা হয়েছে নাটকগুলির রূপরীতি এবং বিশেষ ভাবনাচালিত অভিনয়গুলির প্রয়োগবৈশিষ্ট্য ।

আশি বছরের ব্যাপ্তিতে সদাব্যস্ত রবীন্দ্রজীবনের বিপুল সৃষ্টিসম্ভারে নাটক রচনা ও অভিনয়ই কেবল একটি বড়ো অংশ জুড়ে থাকে নি, সেই সঙ্গে কখনো আত্মতৃপ্তির অভাবে, কখনো বা মঞ্চায়নের স্বার্থে তিনি রচিত নাটকগুলির নানারকম পাঠ বদল করেছেন উপযুক্ত পরিমাণে । সেই সব পাঠান্তর সংবলিত পাণ্ডুলিপি কিংবা মুদ্রিত রূপগুলি রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চচরিত্র অনুধাবনে বিশেষ সহায়তা করতে পারে । অন্যদিকে সেইসব নাটকের মনস্ক পরিচালক যাঁরা, তাঁরাও নিজেদের মঞ্চ অভিপ্রায়ে প্রযোজিত নাটকগুলির সম্পাদনা করেছেন । এই উভয়বিধ সম্পাদনার পর্যালোচনা ছাড়া আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না । তাই এই মুদ্রিত - অমুদ্রিত নাট্যপাঠগুলি এই গবেষণায় বিশেষ কৌতূহলের বিষয় হয়েছে । অন্যান্য ইতিহাসকারদের মতোই বিভিন্ন জনকে লেখা রবীন্দ্রপত্রাবলীর প্রাসঙ্গিক অংশ, বিভিন্ন জনের মূল্যবান স্মৃতি ও মতামত, অভিনয়পত্র কিংবা সংবাদপত্র-কর্তিকা উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে ।

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রেই জানেন, তিনি তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, গল্পে - উপন্যাসে এবং নাটকে দেশ - কালের পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধ জীবনসত্য নানা ভাবে ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে চেয়েছেন আজীবনকাল । সেই জীবনসত্যের রূপটি সঠিকভাবে চিনে নিতে না পারলে অথবা অতি - আধুনিক সমালোচনার বশে তাঁর নাটককে রচয়িতা-নিরপেক্ষ এক জৈব সংগঠন হিসাবে দেখতে গেলে পদে পদে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থেকে যায় । নাট্যজীবনের উপান্তে পৌঁছে পুনশ্চ কাব্যের "নাটক" নামে কবিতাটিতে বস্তুতপক্ষে নাট্যকর্মে তাঁর অভীপ্সা ও উত্তরণের এক দলিল রচনা করেছিলেন তিনি, ৯ ভাদ্র ১৩৩১ সালে । ঠাকুর, ২২ শ্রাবণ ১৩৫০, '১৩১৫' : ২৩৫ - ৩৭) তার শেষ কটি পঙ্ক্তি-

ছিল এই রকম :

বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে ।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য ।

আমরা জানি, দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ একদিকে মঞ্চরূপে ও সুররূপে বাইরের উচ্ছ্বসিত কাব্যস্রোত থেকে ক্রমমুক্ত গদ্যের অন্তরছন্দে নাটককে বিন্যস্ত করবার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন, অন্যদিকে চলতি কালের চাঞ্চল্যকে বিষয় সংগঠনে কী করে চিরকালের স্তব্ধতায় সমাহিত সমন্বিত করা যায়, তার নিরন্তর প্রয়াস করে গেছেন । এই অর্থেই পুরাণে আর আধুনিকে সংযোগ - সম্পর্ক, আধুনিকতায় পুরাণ - মহিমা, পুরাণ দ্যোতিত করে আধুনিককে । 'বাল্মীকি প্রতিভা' থেকে 'রক্তকরবী' হয়ে 'শ্যামা' পর্যন্ত বিস্তারিত তাঁর তীর্থযাত্রায় তিনি এই পুরাণচেতনার ধারক । এই অর্থেই তিনি ভারতনাট্যের পথিকৃৎ । তাঁর এই অভিযাত্রার স্বরূপটি বুঝতে গেলে অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয় তাঁর অন্যবিধ রচনা কিংবা জীবনেতিহাসের সমর্থন সংগ্রহ করবার । তাতে তাঁর নাটকের মঞ্চবৈশিষ্ট্যই আরও স্পষ্টগোচর হয় বলে আমাদের বিশ্বাস । এ প্রসঙ্গে আমরা আর একবার শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায়ের মত উদ্ধৃত করে বলতে পারি" রবীন্দ্রনাটকের তত্ত্ব - চর্চা দরকার নেই । দরকার সরাসরি রবীন্দ্রনাটকে স্নাত হওয়া । দ্বিতীয় শর্ত, যতটা সম্ভব রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনার সঙ্গে সাক্ষাৎ মোলাকাত । আমরা যখন ব্রেখট বা চেখভ করি তখন তো কত পড়াশুনো - গবেষণার ধুম পড়ে যায় । ... রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী নাট্যসাধনায় বিবর্তনের সত্যটি লক্ষণীয় ।" (মুখো, ১০ : ৩) এই গবেষণায় সেই লক্ষণীয় প্রচেষ্টার নানা চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাবে ।

এই গবেষণাকর্মে অনুপ্রেরণা, উপদেশ - পরামর্শ এবং তথ্য সরবরাহ করে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের নামের তালিকা করলে দীর্ঘ হয়ে যাবে । তবু, বিশেষভাবে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার আমার শিক্ষক শ্রী শঙ্খ ঘোষ এবং শ্রী পবিত্র সরকারের নাম । শ্রী ঘোষ প্রতিনিয়তই আমার মতো অনেক

সাধারণ ছাত্রকেই নানা মূল্যবান পরামর্শ এবং দুষ্প্রাপ্য তথ্য কিংবা বই দিয়ে অকৃপণ স্নেহে ঋণী করে রাখেন। শ্রী সরকার কেবল তাঁর ব্যস্ততার অবকাশে আমার এই গবেষণাপ্রয়াসের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে আমার যাবতীয় ভাবনাকে সঠিক পথে চালনা করেছেন, নানা দুর্লভ বই ও তথ্য অকৃপণভাবে দান করে গেছেন। শ্রী প্রশান্ত কুমার পাল, শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় ছাড়াও শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনের সকল কর্মীই আত্মীয়ের সাহচর্যে সবাইকেই অবাধে কাজ করার সুযোগ দিয়ে থাকেন, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বন্ধুদের মধ্যে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ অধ্যাপক সৌমিত্র বসু এবং শ্রী দুর্গা দত্তর কাছে — সুদীর্ঘকাল ধরে তাঁদের বইপত্র আমাকে তাঁরা ব্যবহার করার সুবিধা দিয়েছেন, এখনো দিয়ে চলেছেন। সর্বদা উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন শিক্ষক অধ্যাপক শ্রী স্বপন মজুমদার। শ্রী কুমার রায় এবং শ্রীমতী প্রতিভা অগ্রবাল বহুরূপী সংস্থার নানা দুর্মূল্য তথ্য, মঞ্চ-প্রতিলিপি এবং নাট্যশোধ সংস্থান সংগ্রহের যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য ব্যবহার করতে দিয়ে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় আমাকে বিনম্র করে তুলেছেন। এই সূত্রে সংস্থানের বন্ধুদের নিরন্তর সহায়তার কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি।

বস্তুত এঁরা সকলেই আমার অন্যান্য গবেষণাধর্মী লেখালেখির কাজে নিয়ত যে সহযোগিতা করে থাকেন, এই গবেষণাতেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। সেইসঙ্গে নিরন্তর সহযোগিতা করে চলেন আমার স্ত্রী, নাট্যশোধসংস্থানের গবেষণা-সহায়ক শ্রীমতী ছন্দা সমাদ্দার। তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার বাহুল্যমাত্র।